ঐতিহ্যময় পুণ্যভূমি খড়দহ

ড: শেখর শেঠ

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর মহকুমার অর্ন্তগত ইতিহাসে সমুজ্জল খড়দহ গ্রাম, এখন শহর (খড়দহ পৌরঞ্চল) এক ঐতিহ্যময় পুণ্যভূমি। থানা খড়দহ। এর দক্ষিণ প্রান্তে আর এক পুণ্যভুমি পানিহাটি- সুখচর উত্তর প্রান্তে রাণী রাশমণি পরিবারের অন্নপূর্ণা মন্দির শোভিত টিটগড়। এর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে বি. টি. রোড, আছে খড়দহ ষ্টেশান ও ফেরি ঘাট খড়দহ রিষড়া বা শ্যামের ঘাট।

দক্ষিণেশ্বর বাংলার বিখ্যাত মন্দির। দক্ষিণেশ্বর থেকে দূরত্ব মাত্র ১০ কিমি। নৌকাযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন শ্যামসুন্দরজীউ দর্শনে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী আর খড়দার শ্যামসুন্দর এরা জীবন্ত, হেঁটে চলে বেড়ান, কথা কন, ভক্তের কাছে খেতে চান।" ভক্ত মানসে দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী জীবন্ত। তেমনি খড়দহের শ্যাম সারা বাংলায় ভক্তজনের হৃদয় জুড়ে।

খড়দহের উল্লেখ রয়েছে চৈতন্য মঙ্গল (বিজয়গুপ্ত) কাব্যে।

"আগে পানিহাটি আর আক্না মহেশ।
পুণ্যভুমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ় দেশ।।
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দা কোটাল তাম্বুলি পাথরঘাটা।।"

শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেও খড়দহে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচেতন্যদেব যখন ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ শেষ করেন, তখন তাঁর প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দকে আদেশ দেন গৌড়দেশে নাম ধর্ম প্রচারের, সেটা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

'এতেক আমার কথ যদি সত্য চাহ।
তবে অবিলম্ব গৌড় দেশে যা।
মুর্খ, নীচ, পন্ডিত দুঃখিত যে জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন।।
আজ্ঞা পাই নিতাই চাঁদ সেইক্ষণ।
চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজ গণ।।

শ্রী চৈতন্যের নির্দেশে শ্রী নিত্যানন্দ শ্রীধাম নবদ্বীপে যান। শচীমাতাকে দর্শন করে, শ্রীপাট খড়দহে প্রথম আগমন করেন। এই আগমনের কথা চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

"আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রাম
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় ধাম।
খড়দহ গ্রামে নিত্যানন্দ রায়
কত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়।।"

যখন তিনি খড়দহে এলেন তখন খড়দহে লোক বসতি খুবই কম, কেমন ছিল সেই সময়কার খড়দহ? সেই ব্যাপারে বৃন্দাবন ঠাকুর লিখেছেন—

পুরন্দর পন্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপর চড়ি ক'রে সিংহনাদ।।
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে।
ব্র্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে।।
তখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপর।
কৃষ্ণ প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে।।
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্য দাস থাকে কুতুহলে।।
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়।।

ওই সময়কার বিবরণের খড়দহ থেকে কালক্রমে এক পুণ্য ভূমিতে রূপান্তরের এক আশ্চর্য্য কাহিনী। এই রূপান্তরে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বসবাসহেতুই এই স্থান বৈষ্ণব জগতে শ্রীপাটরূপে খ্যাতি লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে আচার সর্বস্ব হিন্দুধর্মের কঠিন অনুশাসনে সমাজ জীবন মৃতপ্রায়। এই ধর্ম-সংকটকালে জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্যদের প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এই কাজে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সহায়ক হন। অল্পকালের মধ্যেই আচণ্ডাল জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য প্রবির্তত প্রেমধর্ম প্রচার করে 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়' গৌড়ীর বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম সংগঠন ও প্রচারকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ শালীগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা নামে উভয় ভগ্নীদ্বয়কে বিবাহ করেন। গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন সস্ত্রীক নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও সপ্তগ্রামে বসবাস করার পর আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে খড়দহে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিংবদন্তী আছে এই স্থানে বাসস্থানের জন্য স্থানীয় ভূস্বামীর নিকট একখণ্ড জমি প্রার্থনা করলে তিনি বিদ্রূপ করে গঙ্গায় একটি খড় নিক্ষেপ করে বলেন, ওই স্থানে থাকতে। নিত্যানন্দের প্রভাবে সত্যি গঙ্গাগর্ভে একটি চর তৈরি হয় এবং তিনি সেই স্থানে গৃহ নির্মাণ করেন। এই কিংবদন্তী অনুসারেই নাকি গ্রামের নাম খড়দহ। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র (ওরফে বীরচন্দ্র) ও গঙ্গাদেবী নামে নিত্যানন্দের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দের বংশধরগণই খড়দহের গোস্বামী বংশ নামে পরিচিত। শ্রীনিত্যানন্দের বাস্তভিটা বর্তমানে 'কুঞ্জবাটী' নামে খ্যাত। বীরভদ্রও বৈষ্ণব ধর্মের একজন সুযোগ্য প্রচারক ছিলেন। কথিত আছে তিনি একদিন বারশত বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত নেড়া-নেড়িকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। সংক্ষেপে খড়দহের কয়েকটি পুণ্য স্থান—

শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির :— একটি পূর্বমুখী সুবৃহৎ আটচালা মন্দিরের ভিতরের বেদীর উপর রূপা দিয়ে তৈরী মঞ্চে শ্যামসুন্দর নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ কষ্টি পাথর এবং রাধিকা অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত পাকা নাট মন্দির আছে। প্রতিদিন নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে কীর্তনগানাদি অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, নিত্যনন্দের তিরোধান এর পর তাঁর পুত্র বীরভদ্র খড়দহের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু একচক্র গ্রাম থেকে আনা তাঁদের

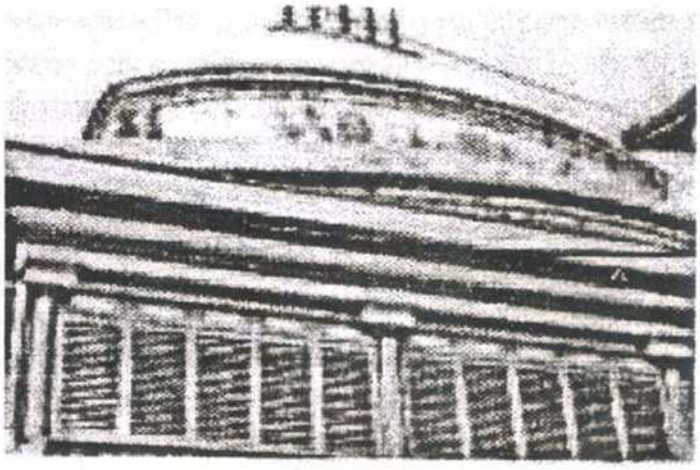

শ্রামসুন্দরজীউর মন্দির

কুলবিগ্রহ বঙ্কিমদেব, ত্রিপুরাসুন্দরী ও অনন্তদেব শিলা নিত্য সেবা পুজা করতেন। মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ সেবিত অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা, ত্রিপুরাসুন্দরী, নিলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড ভঙ্গের একটি খণ্ড শ্রীনিত্যানন্দের স্বহস্তে লিখিত পুঁথি (ভাগবত) রক্ষিত আছে। নিত্যানন্দ বংশের বিভিন্ন শরিক পালা ক্রমে শ্যামসুন্দরজীউর সেবা-পূজা পরিচালনা করেন। বর্তমানে একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক মন্দিরের আয়-ব্যয় নির্বাহিত হয়। কথিত আছে একই শিলা থেকে তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ হয়-খড়দহের শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ, শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভজীউর এবং সাইবোনার নন্দদুলাল বিগ্রহ। মাঘী পূর্ণিমার দিন একই দিনে এই তিন বিগ্রহ দর্শন ত্রিনাথ দর্শন হিসাবে ভক্তজনের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দিরের কয়েকটি উৎসব বিশেষ উল্লেখ্য ১) জন্মাষ্টমী ২) রাস উৎসব (মাস ব্যাপি রাসের মেলা), খিচুড়ি লুট এবং ৩) ঝুলন পুর্ণিমা ৪) ফুলদোল ইত্যাদি। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রী রামকৃষ্ণদেব, শ্রী মা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতার শ্যামসুন্দর দর্শনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির শুধুমাত্র খড়দহের নয়, সারা বাংলার গর্ব ও ঐতিহ্য।

মদনমোহনজীউর মন্দির :- মদনমোহনজীউর মন্দির খড়দহ গোস্বামীপাড়ার শ্যামসুন্দরের মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত। পশ্চিমমুখী আটচালা একটি মন্দিরে মদনমোহনজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের এবং রাধিকা মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত। নিত্য পূজা ব্যতীত বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুল-দোল, গঙ্গার তীরে চাঁচর, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, শরৎকালীন রাসযাত্রা, কার্তিক অমাবস্যায় কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ পূর্বক পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাধিকা চরণ গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবী মদনমোহনজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

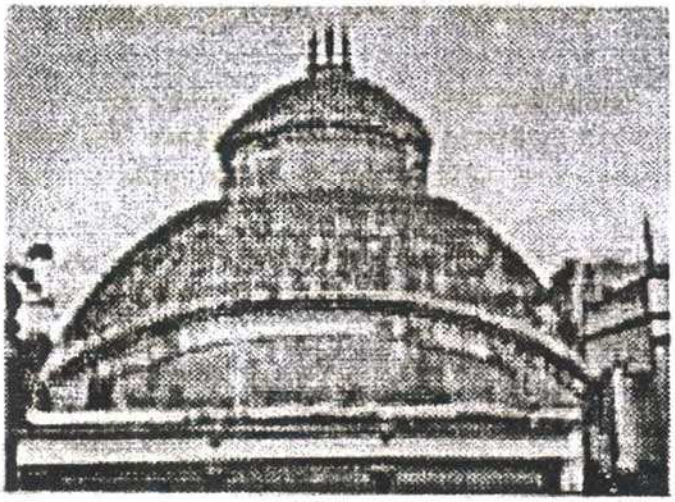

মদনমোহনজীউর মন্দির

দোলমঞ্চ ঃ— খড়দহের একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হল 'দোলমঞ্চ'। যেটি শ্যামসুন্দর ঘাটের সন্নিকটেই অবস্থিত। এই স্থানে কেবলমাত্র একটি শিলাখণ্ড থেকে শ্যামসুন্দরজী, রাধাবল্লভজী (শ্রীরামপুর) ও নন্দদুলালজীর (খড়দহের বনসাই অঞ্চল) মূর্তি তিনটি নির্মিত হয়। যে প্রস্তরখন্ডটি থেকে ঐ ত্রিমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল, তার অবশিষ্টাংশ দোলের দিন জনসাধারনের নিমিত্তে উপবেষ্টিত হয়। বছরের অন্যান্য দিন ছাড়াও বিশেষ করে দোলপূর্ণিমার দিনটিতে এই স্থান ভক্তসমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। বহু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন শুধুমাত্র এই পবিত্র প্রস্তর খন্ড ও শ্যামসুন্দরজীর দর্শন পাওয়ার আশায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার ঐ প্রস্তরখণ্ডে আবির মাখিয়ে ভগবানের কাছে নিজের মনের আশা আকাঙ্খা নিবেদনও করেন।

দোলমঞ্চ

কুঞ্জবাটী :— কুঞ্জবাটী নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থান বলে কথিত আছে। এই স্থানে পূর্বমুখী একটি ঘরে শ্রীনিত্যানন্দের মাটির মূর্তি এবং বাড়ির উঠোনে ...র পত্নী বসুধা ও জাহ্নবার সমাধি স্থান আছে। এই কুঞ্জবাটীতে বীরভ... দ্রামণি জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশ... তিথিতে কুঞ্জবাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে নাম যজ্ঞ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আগে এই কুঞ্জবাটীতেই শ্যামসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুঞ্জবাটী

নবরত্ন মন্দির/মহাপ্রভুর মন্দির :— শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরের কিছু দূরে খড়দহ শহরের মধ্যে একটি বড় ইট দিয়ে তৈরী নবরত্ন মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও জগন্নাথদেবের দারু মূর্তি এবং কৃষ্ণ-রাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, যা মহাপ্রভুর মন্দির নামে খ্যাত। মহাপ্রভুর মন্দিরের নিত্য পূজা ব্যতীত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ছাব্বিশ শিবমন্দির :—গঙ্গার তীরে খড়দহের উত্তর সীমান্তে বাবু ঘাটে যে ছাব্বিশটি শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তা রামহরি বিশ্বাস ও প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত ছাব্বিশটি মন্দিরটি আটচালা

গঠন রীতিতে তৈরী। ঘাটের দক্ষিণ দিকে গঙ্গার পাড়ে সমচতুস্কোণ উঠোনের চারিদিক ঘিরে মোট কুড়িটি মন্দির আছে। এই উঠোনের উত্তর-দক্ষিণে ছয়টি, দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে চারটি এবং পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে ছয়টি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস খড়দহের জমিদার ছিলেন এবং একজন পন্ডিত ও দানবীর হিসাবে স্মরণীয়।

রাস মঞ্চ :—রাস উৎসব উপলক্ষে রঙিন আলোর মালা, শোলার কদম ফুল আর পাখি দিয়ে রাসমঞ্চটিকে সুসজ্জিত করা হয়। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর নানারকম বাজনা ও আলোর রোশনাই চতুর্দোলায় চড়ে রাধিকসহ শ্যামসুন্দরজীউ মন্দির থেকে রাসমঞ্চে যান। আবার বৃদ্ধ-বণিতা ও লোকজন খোল-করতাল নিয়ে রাসের গান গাইতে গাইতে এই শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন। দোলযাত্রা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। খড়দহের শ্যামসুন্দরজীউকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে একদিন, মাঘী পূণিমার উৎসব উপলক্ষে একদিন এবং কার্ত্তিক মাসে রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রায় একমাসব্যাপী মেলা বসে। যার

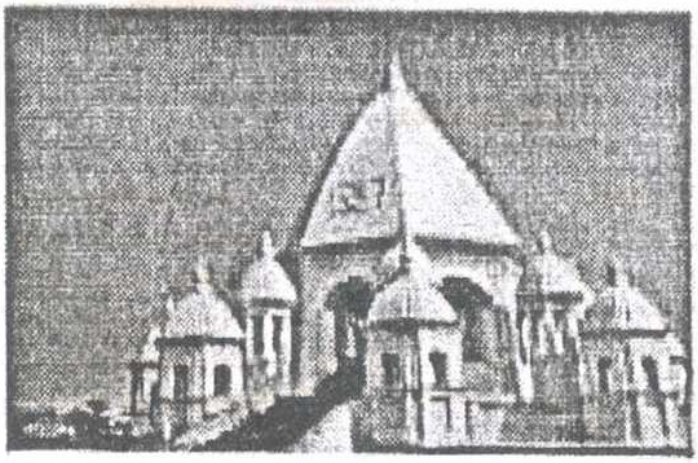

রাসমঞ্চ

মধ্যে রাসযাত্রার মেলাই উল্লেখযোগ্য।

রাধাকান্ত মন্দির:— শ্যামসুন্দর মন্দিরের দক্ষিণে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে খড়দহ-কুলীনপাড়ায় সম্মুখে দালান ও নাটমন্দিরসহ একটি পূর্বমুখী আটচালা মন্দিরে রাধাকান্ত নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরটি স্থানীয় শিরোমণিদিগের এবং শোনা যায় এটি খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নির্মিত। এখানে নিয়মিত পূজা পাঠ হয়। ভক্ত জনসাধারন এর বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এই নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়।

রাধাকান্ত মন্দির

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (সোনার মন্দির) :—কুলিনপাড়ায় গঙ্গার তীরবর্তী বলরাম ধর্ম সোপান রোডে চারদিকে ফুল ও ফলের বাগান বেষ্টিত প্রাঙ্গণের মাঝখানে প্রাসাদতুল্য পশ্চিমমুখী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ১৩৫৩ সনের ২১ শে বৈশাখ স্বামী যতীন্দ্র রামানুজ দাস দ্বারা স্থাপিত। মূল মন্দিরে সুউচ্চ পাঁচটি চূড়ার মধ্যেরটিতে পর পর তিনটি সুবৃহৎ পিতলের কলসী এবং তার উপর একটি বিষ্ণুচক্র স্থাপিত আছে। মন্দিরের ভিতরের শ্বেত পাথরের বেদীর উপর বাঁদিকে লক্ষ্মীদেবী ছাড়াও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি ও আছে। এছাড়াও মন্দিরে বলরাম স্বামীর মর্মর মূর্তিও আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বাশ্রমের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ ইন্দুভূষণ বসুর আরও অনেকগুলি জনহিতকর কার্য স্মরণীয়। যথা—বলরাম হাসপাতাল, শ্রী বলরাম শিক্ষায়তন, মুদ্রণ প্রেস, উজ্জীবন পত্রিকা এবং বিবিধ প্রকাশনা, মহিলাদের বয়নশিল্প শিক্ষা ইত্যাদি।

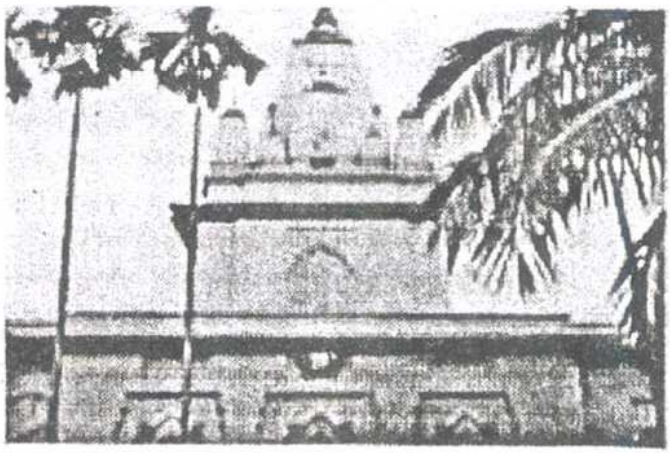

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (সোনার মন্দির)

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন :—১৯৪৩ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সারা বাংলাতে এক কালো বিষাদের ছায়া এনে হাজির করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ শেষ হল। সরকারের শিক্ষা বিভাগ তখন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন বাংলার দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত পিতৃ-মাতৃহীন কিছু শিশুর লালন পালন করার পর নেওয়ার জন্য। এই সময়ে কলকাতার "বসুমতী পত্রিকা সাহিত্য মন্দির" প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তার পুত্র রামচন্দ্র ও কন্যা প্রীতিদেবীর অকাল প্রয়াণে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২৪ পরগণা রহড়া গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ তার পত্নী রামচন্দ্র ও কন্যা প্রীতিদেবীর অকাল প্রয়াণে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২৪ পরগণা রহড়া গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ তারপত্না শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীর মাধ্যমে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। এরপর বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন, ২৪ পরগনাস্থ রহড়ায় একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দুর্গত শিশুদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন।

সুখচর মৌজায় প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি:— খড়দহের দক্ষিণ-পশ্চিম কুলীন পাড়ায় মৌজায় কয়েক বছর আগে মাটির তলায় একটি বিশাল কালো পাথরের ১০টন ওজনের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ৯ ইঞ্চি মোটা (পুরু) খিলান পাওয়া গেছে। এই পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে একটি বৌদ্ধমূর্তি—৬ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি চওড়া। পাথরসহ বৌদ্ধমূর্তিটি পাওয়া গেছে স্বামী মহাদেবানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চত্বর থেকে। বর্তমানে খড়দহ পুরসভার সংগ্রহশালায় বৌদ্ধমূর্তিটি সংরক্ষিত আছে যা এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি:—পঞ্চানন তলায় কয়েকবছর আগে বহুতল নির্মাণ

কালে খনন কার্য করার সময় এক অপূর্ব কালো প্রস্তর খণ্ডের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এটি 'সেন বংশ' আমলের নিদর্শন হিসাবে অনেকেরই অনুমান। আরো কয়েক বছর আগে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিটির কাছাকাছি অঞ্চলেই প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি সহ বিশাল প্রস্তর খিলান এবং প্রাচীন টেরাকোটা শিবমন্দির তিনটি প্রমাণ করে খড়দহ সুখচর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে উন্নত জীবন ধারা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্বে প্রথমে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, পরবর্তীকালে সেন বংশ আমলে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি ও তারও পরে শৈব সংস্কৃতির পরম্পরার ধারা লক্ষ্য করা যায়।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি

রবীন্দ্র উদ্যান বা ভাষা উদ্যান ঃ— খড়দহ ফেরী ঘাটের পাশে এই উদ্যানের কাছে রয়েছে শ্যাম ঘাট। এই সেই ঘাট। যেখানে অপেক্ষায় থাকত রবিঠাকুরের বোট 'পদ্মা'। বিশ্বকবি গঙ্গার পাড়েই বাড়ি ভাড়া করে কিছুদিন বসবাস করেছেন। 'পদ্মা' বোটের সেই প্রতিচ্ছবি মাখা জল আজও স্মৃতির অ্যালবাম হয়ে নি:শব্দে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামসুন্দর ঘাটে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "জয়ন্তী উৎসবের পর কবি সপরিবারে কলিকাতার উপকণ্ঠে খড়দহে যান। কলিকাতা হইতে রেলপথে ১৪ মাইল দূরে। নতুন বাড়িতে নতুন পরিবেশে কবির মন কাব্যরচনায় ডুবিল। খড়দহ বাসকালে যে কবিতাগুলি লেখেন, তার অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে 'বিচিত্রায়'র মধ্যে, কয়েকটি 'বীথিকা' ও 'পরিবেশেষ' গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।"

অন্নপূর্ণা মন্দির :—খড়দহের দোলমঞ্চপাড়ার লাহাদের বাড়ীতে সমতল ছাদ্ বিশিষ্ট একটি পৃথক মন্দির শ্বেত পাথরের বেদীর উপর নানা স্বর্ণালঙ্কারে শোভিতা অষ্টধাতু নির্মিত অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বারিক নাথ লাহা ও বাদলমনি দাসী কর্তৃক অন্নপূর্ণা বিগ্রহ স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে পৃথক একটি মঞ্চে দারুময় গৌর-নিতাই বিগ্রহ এবং শ্বেত পাথরের একটি গণেশ মূর্তি ও নারায়ণ শিলা আছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির অন্নভোগ দ্বারা নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে এবং চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণা পূজা হয়। এছাড়া, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কাঠিয়া বাবা আশ্রম সুখচর :—খড়দহে দক্ষিণ প্রান্তে সুখচরে পঞ্চাননতলা ঘাট সংলগ্ন গঙ্গার তীরে এই আশ্রমটি অবস্থিত। এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী। ১৯৬৪ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান প্রধান ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাস মহারাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। দেশে ও বিদেশে ভারতের মানবিক আদর্শের সাহায্য প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত। বহু ভক্ত ও শিষ্য নিরন্তর পথ নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেয়ে উপকৃত। অতি মনোরম পরিবেশে মন্দির সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রয়েছে গোশালা, পাঠাগার ও অতিথিশালা ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র। নিত্য পূজা ও আরতি অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন তিথিতে বিশেষ পূজা ও ভোগ উৎসব হয় ও দুর-দুরন্ত থেকে ভক্ত-সমাগম হয়।

খড়দহকে এক কথায় মন্দির নগরী বলা যেতে পারে। মন্দির ও ধর্ম স্থান ছাড়াও এখানে আরো রয়েছে দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান ও ঘাট। অনেক মহাপুরুষ এই খড়দহে এসেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা এবং আরো অনেকে। একটি গভীর শান্তিতে আমরা ধীরে ধীরে একটি খড়দহের পুরানো ঘাটে অবতরণ করলাম। সুন্দর ইট দিয়ে তৈরি ঘাট। প্রতি পাশে শোভাময় ভবন। বর্ষাকালে গঙ্গার তীরবর্তী স্থান ভ্রমণের জন্য অতি মনোরম। কানায় কানায় পুর্ণ নদী এবং সতেজ বায়ু এর সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে। কিন্তু যখন কেউ গোঁসাইদের পুরানো সুন্দর বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় তখন সে এর বৈশিষ্ট্য জানতে পারো এই বাড়ির প্লাষ্টারহীন দেওয়ালের অপূর্ব কারুকার্য এবং তার মান এতই ভাল যে সেখানে কোন অলংকরণের প্রয়োজন হয়নি। খড়দহের গলির শান্ত পরিবেশের বাড়িগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিমের কিছু বিদ্যালয়ের শিল্পমণ্ডিত ও মর্য্যাদাপূর্ণ বাড়িগুলির অনুকরণে তৈরি। ঘাটের কাছে অদ্ভুত নির্মাণ মন্দির রাসমঞ্চের দেখা পেলাম। এর কিছু দূরে আমরা পৌছালাম সেই বিখ্যাত শ্যামসুন্দর মন্দিরে। ইঁটের তৈরি পথ দিয়ে শ্যামসুন্দর মন্দিরে পৌছবার পর তার সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হতে হয়, মন্দিরের প্রবেশ করার কিছু সময়ের পর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রবেশ করে আমাদের নাট মন্দিরে এসে দেখতে বললেন। আগত অতিথির সঙ্গে একজন বিদেশী মহিলা আছেন, এখানে আমাদের নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া উচিৎ বলে ওনাদের মনে হয়েছিল। তখন নিজেদের যেন নূতন করে সম্মানিত বোধ করি। তাঁরা প্রভু নিত্যানন্দের নিজের হাতে লেখা শ্রীভাগবতের অনুলিপি আমাদের কাছে উপস্থিত করলেন এবং তার প্রত্যেকটা শব্দ যেন এক একটা ছবি মনে হয়েছিল যা খুবই প্রাচীনকালের কলম দিয়ে পুরানো কাগজের ওপর লেখা। এমন কোন শব্দ বা অক্ষর ছিল না যার মধ্যে অসঙ্গতি বা ভুল ছিল।

প্রভু নিত্যানন্দের মুক্ত, আনন্দ, সুমিষ্ট ও সৌন্দর্যপূর্ণ হৃদয় যেন আমাদের সামনে প্রতিভাত হলো। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভ্রাতাকে গৃহস্থ এবং নাগরিক জীবনে যেতে আদেশ দিলেন। তিন বছর ধরে শ্রীচৈতন্যের পাশাপাশি তিনি বাংলার গ্রাম ও শহরে প্রেম ও ভালবাসা শিক্ষার জন্য ভ্রমণ করেছিলেন। খড়দহ শুধু মাত্র স্মৃতি অথবা কোন বড় ঘটনার সাক্ষী নয়, এখানকার সম্প্রদায় বংশানুক্রমে এর ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে। শত শত বৎসর ধরে হিন্দুধর্মের এই শিক্ষার জন্য তাঁদের তীব্র প্রচেষ্টা ছিল। প্রসাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখান থেকে যাবার কোন উপায় ছিল না। খড়দহের সাধারণ মানুষেরা, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যরা একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করার পর সন্ধ্যার আরতির জন্য উপস্থিত হলেন। নানারকমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর ঘন্টাধ্বনি বেজে ওঠে এবং এই স্থানটির চারিদিক আলোকিত হলো। এই স্থানের ইতিহাস ও অপরূপ অনুভূতি আগামী চারশো বছরেও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। "সত্যই এ এক অবিস্মরণীয় অনুভূতি"।